নিবন্ধ

হিটলারের পুনর্জন্ম

নির্মলেন্দু গুণ

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল সোয়া আটটায় আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা নগরীতে তাদের নব-আবিষ্কৃত পরমাণু বোমা 'লিটল বয়'-এর বিস্ফোরণ ঘটায়। আমার জন্মের ঠিক এক মাস ষোল দিনের মাথায় মানব-সভ্যতার ইতিহাস-কাঁপানো এই চরম-বর্বর বা ইতিহাসের এযাবৎকালের বর্বরতম ঘটনাটি ঘটায় আমি খুব বিব্রত বোধ করি। ভাবি, মানব-সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের এই 'পরাবর্বর' (পরমাণু বোমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি এই নতুন শব্দটি আজই তৈরি করলাম) অপরাধটি সংঘটিত হলো কি না, বেছে বেছে ঠিক আমার জন্মের বছরটিতেই। আহা, আমি কি অপয়া তবে?

অনেকেই বলতে পারেন, কেন ঐ বছরটি খারাপ কিসে? আপনি নিজেকে অপয়া ভাবছেন কেন? ঐ বছরটি তো খুবই পয়মন্ত একটি বছর। ঐ বছরই তো অবসান হয়েছে প্রায় অর্ধযুগ ধরে প্রলম্বিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। বর্বর অক্ষশক্তির (জার্মানি, ইতালি ও জাপান) ঐতিহাসিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে মিত্রশক্তির (আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রত্যাশিত বিজয়। তা না হলে এই চিরমনোরম পৃথিবী যে রসাতলে যেতো। হিটলার-মুসোলিনি-তোজো চালিত অশুভ চক্রের হাত থেকে এই বিশ্বকে রক্ষা করেছে রুজভেল্ট-ট্রুম্যান-চার্চিল-স্ট্যালিন পরিচালিত শুভ চক্র, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর বর্তমান বিশ্বে এখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ইঙ্গ-মার্কিন পরাচক্র হিসেবে প্রদীপ্যমান।

আমি তাদের চিন্তার সঙ্গে একমত হতে পারলে খুবই খুশি হতে পারতাম। কিন্তু প্রথমত জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির লক্ষাধিক নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে পরমাণুবোমার আঘাতে হত্যা করে, দুটি নগরীকে আক্ষরিক অর্থেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা কোনোভাবেই আমার কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি। এর মধ্যে মিত্রশক্তির বীরত্ব তো নয়ই, বরং তার মধ্যকার বর্বরতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে, যা অক্ষশক্তিকৃত যাবতীয় অপকীর্তিকে ম্লান করে দেয়ার জন্য যথেষ্টরও অধিক।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তান্ডবমুক্ত আমার জন্ম-পরবর্তীকালের ইতিহাস আমাকে খুব খুশি হওয়ার সুযোগ দেয়নি। দুইশত বছরের পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেয়ে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে

ভারতের খন্ডীকরণ, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আমার মতো ধর্ম-নির্ধারিত সংখ্যা বিচারে যারা লঘু–, তাদের জীবনে সাম্প্রদায়িক-পরাধীনতার এক নবযুগের সূচনা করে। যার মূল্য আমার মতো, জানি আরও অনেককেই দিতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে ছিন্ন হয়ে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্মগ্রহণ করা বাংলাদেশ দ্বিজাতিতত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তিটাকে কিছুটা নড়বড়ে করতে পারলেও, তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে এমন এক নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে, যা দর্শনগতভাবে সাম্প্রদায়িক। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ পুরনো ইতিহাসে তার কাজ চলবার কথা নয়। তাই নতুন বাংলাদেশের চাহিদা পূরণে প্রণীত হয়েছে নতুন ইতিহাস। এটাই স্বাভাবিক। বিকৃত দর্শন কখনও অবিকৃত ইতিহাসের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না। তাই জাতির সামনে নতুন ইতিহাস উপস্থাপন করাটা তখন জরুরি হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী ও তাদের সমর্থকরা গত ষাট বছর ধরেই ঐ মহাযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করে চলছে। ইতিহাস রচনা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়ের গৌরব অর্জনের পাশাপাশি চার্চিল সাহেব তো নোবেল পুরস্কারটি পর্যন্ত বাগিয়ে নিয়েছেন। ব্যক্তি হিসেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

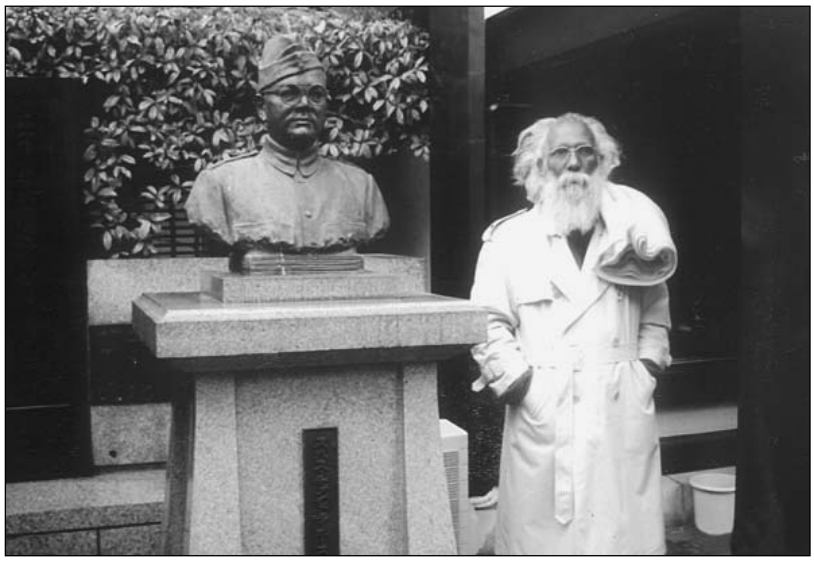

tbZvRx mfvI P›` emi Ave¶ gwZi cv‡k

সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়ারি চার্চিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি একদিকে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন ও ১৯৫৩ সালে সহিত্যে নোবেল পরস্কার লাভ করেন। যুদ্ধবাজ হেনরি কিসিঞ্জারের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

হিটলারের নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের অজস্র রোমহর্ষক কাহিনী শুনে শুনে অনেকের মতো আমিও বড় হয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে নিয়ে কতো ছবি, কতো গান, কতো কাব্য, কতো নাটকই না লেখা হয়েছে দেশে দেশে। কতো চলচ্চিত্রই না নির্মিত হয়েছে। এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগর-তীরের দেশগুলোতে দখলদার জাপানিদের বর্বরতার কথাও আমরা জেনেছি আমাদের কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিকদের লেখায়। একসময় অগ্রজ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি নিজেও কিছু কিছু লিখেছি।

কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটানোর পরাবর্বর ঘটনাটি ছাড়া বিজয়ী মিত্রবাহিনীর অত্যাচার ও বর্বরতার কাহিনী খুব কমই জেনেছি আমরা। আসলে আমাদের জানতে দেয়া হয়নি। হিটলার-বিরোধী প্রচারমাদকে আচ্ছন্ন ইতিহাসবিদরা মুদ্রার উল্টো পিঠটা কেমন, তা দেখার আগ্রহ মনে হয় হারিয়ে ফেলেছিলেন। বা খুব একটা গা করেননি। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আদর্শিক দুর্বলতার কারণে, একটা প্রগতিশীল ঘোরের ভিতরে হাবুডুবু খেয়েই আমাদের অনেকেরই কাল কেটেছে। কিন্তু অবাধ তথ্য প্রবাহের এই বিশ্বায়ন যুগে আমরা এমন সব তথ্য এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারছি, যেগুলো ইন্টারনেট না হলে আমাদের অনেকের পক্ষেই জানা সম্ভব হতো না। প্লাবনের পর যেমন ভালো ফসল ফলে, সোভিয়েতের পতনের পর তেমনি একসেস টু ইনফরমেশনস সহজ হয়েছে। মন্দের বিপরীতে এটাই আমাদের পাওয়া। এমন বহু তথ্য এখন জানা যাচ্ছে, যা দশ বছর আগেও ছিলো অকল্পনীয়। তা না হলে আমার মতো একজন অগবেষকের পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি কৃত অপরাধের চিত্র পাঠকের দরবারে তুলে ধরা সম্ভব হতো না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তীকালে হিটলার, মুসোলিনি আর গোয়েবলসের কুশপুত্তলিকার আড়ালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিত্রশক্তির সৈনিকদের দ্বারা সম্পাদিত অপরাধসমূহকে এমনভাবে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিলো যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা বর্ষণের মতো বড় আপরাধের ঘটনাটিও বিশ্বের অনেক রাজনীতিক-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর চোখে তত বড়ো হয়ে ধরা পড়েনি। অনেকে বুঝতেও পারেননি হিরোশিমা নাগাসাকিতে আসলে কী ঘটেছে। ১৯৪৫ সালে সংবাদ মিডিয়া ছিলো খুবই দুর্বল। আর এটমবোমার সঙ্গে বিশ্ববাসীর পূর্ব-পরিচয় ছিলো না বলে এর ধ্বংসক্ষমতা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, হয়েছে, তাও বুঝে উঠতে পারেনি অনেকেই। আবার অনেকে বুঝতে পেরেও চেপে গিয়েছেন। ভেবেছেন, এ্যান্ড হ্যাজ জাস্টিফাইড দি মিনস।

আমি আমার বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে থাকা মাওলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' থেকে উদ্ধৃত করছি। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার পরমাণু বোমা বর্ষণের খবর ধীরে-ধীরে রাষ্ট্র হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, যা তাঁরই অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর বেশকিছুকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

'আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, জাপানের ওপর পরমাণু বোমা ফেলার কোনো যুক্তিই ছিলো না। ... এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীকেই শঙ্কিত করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছিলো– বিশ্বজনমত তখন একবাক্যে জার্মানির নিন্দা করেছে। দানবিকতার জন্য তখন যদি জার্মানিকে ধিকৃত হতে হলো... তো এরচেয়ে জঘন্য অপরাধ করেও আমেরিকা পার পায় কীভাবে? আমি মনে করি জাপানের ওপর পরমাণু বোমা বর্ষণ করে আমেরিকা যুদ্ধে অনুমোদনযোগ্য অস্ত্র ব্যবহারের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে, যা তার মিত্রদের সম্মান এবং মিত্রদের বীরত্বের দাবির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আমি গভীর বেদনার সঙ্গে আরও লক্ষ্য করেছি যে, প্রতিবাদ বা নিন্দা তো দুরের কথা,– মিত্রবাহিনী এই ঘটনাটিকে দুর্দান্ত বিজয় বলে সাধুবাদ জানিয়েছে।'

[ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম : ১২৭ পৃ:]

বাংলাদেশের জন্মপ্রক্রিয়ায় সাহায্য প্রদানকারী মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তো বলাই যায় যে হিটলারের ভবিষ্যদ্বাণী একটু বিলম্বে হলেও ফলেছে। হিটলার ভেবেছিলেন, রাশিয়া আক্রমণ করলে মিত্রশক্তির ঐক্যবলয়ে ফাটল ধরানো যাবে। কেননা, পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্রটির ধ্বংসসাধনে পুঁজিবাদী আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স সবারই কম-বেশি আগ্রহ ছিলো। হিটলার জীবদ্দশায় তাঁর ধারণার সত্যতা দেখে যেতে না পারলেও তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা দেখেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান আর স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা এক ও অভিন্ন। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, স্নায়ুযুদ্ধের শুভ উদ্বোধনের ভিতর দিয়েই যবনিকাপাত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। আর নব্বই দশকের শুরুতে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লুপ্তির ভিতর দিয়ে,